Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 357 – 368
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গলে লোক-সংস্কৃতির উপাদান

অভিজিৎ পাল
ছাত্র, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : avipal2015@gmail.com

Keyword
বিশ্বম্ভর দাস, জগন্নাথমঙ্গল, লোক-সংস্কৃতি, মঙ্গলকাব্য, অপ্রধান মঙ্গলকাব্য, জগন্নাথদেব, বাঙালির সংস্কৃতি, লোকায়ত সমাজ, প্রাগাধুনিক সাহিত্য।

Abstract
প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যধারা মঙ্গলকাব্য। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও কয়েকজন কবি মঙ্গলকাব্য লেখার প্রয়াস করেছিলেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারার শেষ ভাগের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম নিভৃতচারী জনপ্রিয় কবি বিশ্বম্ভর দাস। তিনি বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ছাঁচে ফেলে পুরীর জগন্নাথদেবের পুরাণ প্রসিদ্ধ মঙ্গলকথা লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কোনো রাজানুগ্রহ ছাড়া শুধুমাত্র গুরুদেবের আজ্ঞাবহ হয়ে সাধারণ বাঙালির উপযোগী সহজ বোধগম্য ভাষায় জগন্নাথের মঙ্গলকথা প্রচার করতে চেয়েছিলেন কবি বিশ্বম্ভর দাস। আর এই প্রয়াসকে সফল করে তুলতে তিনি তাঁর জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে বাংলার লোক-সংস্কৃতির একাধিক উপাদানকে অনায়াসে ব্যবহার করেছিলেন। অবশ্য একথাও ঠিক, যে সময়ে কবি বিশ্বম্ভর দাস জগন্নাথমঙ্গল রচনা করেছিলেন তখন পাশ্চাত্যে লোক-সংস্কৃতির তত্ত্ব ও উপকরণ নিয়ে চর্চা শুরুই হয়নি। বাঙালি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে, সংস্কার রয়েছে, সংস্কৃতি রয়েছে, আচার-অনুষ্ঠান, গণ-বিশ্বাস, নীতি-নিয়ম, প্রথা রয়েছে এবং এগুলির সবই মূলত বাঙালি জনগোষ্ঠীর বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা প্রচলিত রয়েছে বহু প্রজন্ম ধরে। আর বাঙালি সমাজ বা জনগোষ্ঠীর থেকে উদ্ভূত এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে উত্তরাধিকার পরম্পরায় প্রবাহিত বিভিন্ন প্রকরণ থেকে কবি বিশ্বম্ভর দাস সংগ্রহ করেছিলেন বাংলার লোকসংস্কৃতির অজস্র লোক-উপাদান। প্রকৃতিগত ভাবে বাঙালির নিজস্ব লোক-সংস্কৃতির উপাদানগুলি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন— বাক্‌কেন্দ্রিক, বস্তুকেন্দ্রিক, আচার-ব্যবহারকেন্দ্রিক, লিখনকেন্দ্রিক, অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক, বিনোদন ও ক্রীড়া কেন্দ্রিক ইত্যাদি। কবি বিশ্বম্ভর দাস তাঁর জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে যে সমস্ত লোক-সংস্কৃতির উপাদান জড়ো করেছেন তার অধিকাংশই কবির ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতা ও পাঠ-অভিজ্ঞতার সূত্রে পাওয়া। কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গল কাব্যের প্রধান আখ্যান অংশটি স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডের অন্তর্গত পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য-এর অনুসারী হলেও কাব্য রচনার সময় কবির প্রধান প্রচেষ্টা ছিল পৌরাণিক জগন্নাথ-কাহিনিকে বাংলার জগন্নাথ

উপাসনার সঙ্গে মিলিত যেন করে দেওয়া যায়। কবি বিশ্বম্ভর দাস বাংলার লোকায়ত সমাজের বহুবিধ অনুসঙ্গ বারবার তুলে ধরেছেন জগন্নাথমঙ্গলের বিভিন্ন অংশে। কবির এই সচেতন ও সুসম প্রয়াসের জন্যই উৎকলেশ্বর জগন্নাথের পৌরাণিক কাহিনি সম্বলিত জগন্নাথমঙ্গলে লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলি অবাঞ্ছিত হয়নি। কবি বিশ্বম্ভর দাস তাঁর জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে যে সমস্ত লোক-সংস্কৃতির উপাদান জড়ো করেছেন তার অধিকাংশই কবির ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতা ও পাঠ-অভিজ্ঞতার সূত্রে পাওয়া। কবি বিশ্বম্ভর দাসের এই অনন্য প্রয়াসের জন্য সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বৃত্তে জগন্নাথমঙ্গল অনায়াসে হয়ে উঠতে পেরেছে সর্বস্তরের বাঙালির উপভোগ্য কাব্য এবং বিশ্বম্ভর দাস হয়ে উঠেছেন একজন কালোত্তীর্ণ যশস্বী কবি।

Discussion

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোনো রাজপৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া অতিনিভৃতে বাংলা ভাষায় এক ও অদ্বিতীয় জগন্নাথ বিষয়ক মঙ্গলকাব্য 'জগন্নাথমঙ্গল রচনা করেছিলেন কবি বিশ্বম্ভর দাস। প্রাচীন উৎকলের শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে জগন্নাথদেবের দারুব্রহ্মরূপে প্রকটিত হওয়ার যে পৌরাণিক কাহিনি স্কন্দপুরাণের বিষ্ণু খণ্ডের অন্তর্গত পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য পর্বে রয়েছে, সেই বহুল পরিচিতি কাহিনির আখ্যানের অনুবর্তী হয়ে সেই কাহিনিকে বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ছাঁচে ফেলে কবি বিশ্বম্ভর দাস একটি নতুনতর মঙ্গলকাব্যের জন্ম দিতে পেরেছিলেন। কবি বিশ্বম্ভর দাস কখনই কোনো রাজানুগ্রহ অভিলাষী ছিলেন না, তিনি কবিযশপ্রার্থীও ছিলেন না, তিনি শুধুমাত্র তাঁর গুরুদেবের নির্দেশকে শিরোধার্য করে জগন্নাথদেবের মঙ্গলকথা বৃহত্তর সাধারণ বাঙালি জনতাবোধ্য বাংলা ভাষায় প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কবি বিশ্বম্ভর দাস পুরীধামে গিয়ে সপার্ষদ মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের দর্শন করে বঙ্গে ফিরে এসে জগন্নাথের পৌরাণিক আখ্যান পুরাণজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কাছে অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন। কবি বিশ্বম্ভর দাস নিজেও সংস্কৃত ভাষায় পারঙ্গম ছিলেন। একজন কাব্য-সচেতন ও সংস্কৃতি-মনস্ক বাঙালি হিসেবে তাঁর কাছে অখণ্ড বঙ্গদেশের মঙ্গলকাব্যের রূপ-রীতি স্পষ্ট ছিল। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ রূপ অবলম্বন করে জগন্নাথের নতুন-মঙ্গলকথা লিখতে হলে স্কন্দপুরাণের বহুল প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনি পরম্পরাকে বজায় রেখে সেই পরিচিত কাহিনিকে অতি সতর্কতার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের রূপ দিতে হবে এবং এমন করতে পারলেই তাঁর লেখা নতুনতর কাহিনি সম্বলিত মঙ্গলকাব্য সাধারণ মানুষের কাছেও হয়ে উঠতে পারবে নতুনতর কাব্য-আস্বাদনের বিষয়। বলাবাহুল্য, কবি বিশ্বম্ভর দাসের পরিশীলিত চিন্তাপ্রসূত সেই কাব্য, জগন্নাথমঙ্গল প্রাগুক্ত দুটি উদ্দেশ্যই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

মঙ্গলকাব্যধারার আদিম পর্বে বাংলার মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য সম্বলিত আখ্যানগুলি অখণ্ড বঙ্গদেশের লোকজীবন থেকে উত্থিত হয়ে ধীরে ধীরে ছড়া, ব্রতকথা ইত্যাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী মধ্যভাগ পর্যন্ত এই সময়ে বহুল প্রচলিত লোকজীবনজাত কাহিনিগুলি ছোট ছোট পদ ও পালার মাধ্যমে মঙ্গলকাব্যের প্রাথমিক রূপ পেতে শুরু করেছিল। পরবর্তী সময়ে প্রচলিত এই টুকরো টুকরো কাহিনিগুলিকে একত্রে মিশিয়ে একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক আখ্যানযুক্ত কাহিনি তৈরি হতে শুরু করেছিল। এরপর অচিরেই এক একজন শক্তিশালী কবির হাতের স্পর্শে জন্ম নিতে শুরু করেছিল বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে অর্থাৎ বাংলা মঙ্গলকাব্যের আদিপর্বে মূলত মনসা, চণ্ডী ও ধর্ম দেবতার মঙ্গল আখ্যানই বঙ্গময় প্রসারের সুযোগ পেয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে প্রায় দুই শতাব্দী ব্যাপী মঙ্গলকাব্যের একই আখ্যান নানাভাবে শুনতে শুনতে যখন বাঙালি কাব্যভোক্তারা ক্লান্তি বোধ করতে শুরু করলেন তখন থেকেই মঙ্গলকাব্যের বলয়ে নতুনতর কাহিনির চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে বাংলার মঙ্গলকাব্য মনসা, চণ্ডী ও ধর্ম দেবতার পূজাপ্রসার ও মাহাত্ম্যবাহী আখ্যানকে অতিক্রম করে আরও নতুনতর কাহিনি সম্বলিত মঙ্গলকাব্য লেখার প্রতি কবিদের ঝোঁক তৈরি হতে শুরু করেছিল। অচিরেই এই পর্বে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের পাশাপাশি জন্ম নিতে শুরু করেছিল ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য। কিন্তু এখানেই তৎকালীন কাব্যভোক্তাদের চাহিদা থেমে থাকেনি। লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী নতুন করে বিভিন্ন বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক

পথের আরাধ্য জনপ্রিয় দেবদেবীর কাহিনিকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন মঙ্গলকাব্য লেখার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে বাংলায় সূর্য, সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, কালী, শিব ও জগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করেও মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের এই দীর্ঘ ও ব্যাপ্ত যাত্রাপথে অখণ্ড বঙ্গের জনজীবন ও লোকসমাজে সাধারণ মানুষকে প্রত্যেকদিনের জীবনযাপনে যেসব আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় সমস্যার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয় সেসবও ধীরে ধীরে মঙ্গলকাব্যে জুড়ে যেতে থাকে। সেই সূত্রেই বাঙালির আদরের মঙ্গলকাব্যের দেহে ধীরে ধীরে মিশে যেতে শুরু করেছিল বাংলার নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ, আচার-অনুষ্ঠান, গণ-বিশ্বাস, নানা ধরনের সংস্কার, প্রথা, প্রচলিত সামাজিকতা, অভ্যেস, বাংলার ভূপ্রকৃতি ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গলেও এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বাংলায় 'লোক-সংস্কৃতি' শব্দটি ইংরেজি Folklore শব্দের আভিধানিক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে William Thoms সর্বপ্রথম folklore শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সেই সময় থেকে পাশ্চাত্যে লোক-সংস্কৃতি বা folklore-এর ধারণা পর্বে পর্বে একাধিকবার বিবর্তন লাভ করেছে। Journal of Folklore অনুসারে আধুনিক সময়ে ইংরেজি ভাষায় ব্যাপ্তার্থে folklore বলতে বোঝায় –

"folklore is a function of shared identity whitin any social group."[১]

এই সূত্রটি ধরে বলা যেতে পারে, folklore বা লোক-সংস্কৃতি হল এমন একটি ক্রিয়া বা প্রণালী বা বিষয়, যেটি কোনো এমন জনগোষ্ঠী যাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে, সংস্কার রয়েছে, সংস্কৃতি রয়েছে এবং এগুলির সবই সেই জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা প্রচলিত রয়েছে বহু প্রজন্ম ধরে। আর এই লোকসমাজ বা জনগোষ্ঠীর থেকে উদ্ভূত এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে উত্তরাধিকার পরম্পরায় প্রবাহিত বিভিন্ন প্রকরণ থেকে লোক-উপাদানের সৃষ্টি হয়ে থাকে। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে অখণ্ড বঙ্গে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সূত্র ধরে বাংলাভাষী বাঙালি জনগোষ্ঠীর সূচনা হয়েছিল। এরপর থেকে ধীরে ধীরে এখানে বাঙালি জাতিসত্ত্বার উন্মেষ ঘটেছিল। বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বহু শতাব্দী ধরে বাহিত নিজস্ব ভাষা, রীতি-রেওয়াজ, আচার-অনুষ্ঠান, গণ-বিশ্বাস, নানা ধরনের সংস্কার, প্রথা, প্রচলিত সামাজিকতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রচলিত রয়েছে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলি বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহু প্রজন্ম ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে এখনও সচল রয়েছে। এগুলি বাঙালি জনগোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব সম্পদ, যা বাঙালি জনগোষ্ঠীর অন্যতম ঐতিহ্যের স্মারকও বটে। প্রকৃতিগত ভাবে বাঙালির নিজস্ব লোক-সংস্কৃতির উপাদানগুলি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন— বাক্‌কেন্দ্রিক, বস্তুকেন্দ্রিক, আচার-ব্যবহারকেন্দ্রিক, লিখনকেন্দ্রিক, অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক, বিনোদন ও ক্রীড়াকেন্দ্রিক ইত্যাদি। যে কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সৃষ্টি হওয়া সাহিত্য সেই সভ্যতার মানুষের বহুমুখী জীবনের ছায়ামাত্র। তাই সাহিত্যের মধ্যে জীবনের বিভিন্ন উপাদান সংযুক্ত হয়ে তাকে আরও বেশি আস্বাদ্য করে তোলে। বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি প্রথম পর্ব থেকে বাঙালির লোকজীবন থেকে উত্থিত হয়েছিল বলে মঙ্গলকাব্যে বাঙালির আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ও লোক-সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গলেও এর তেমন একটা অন্যথা ঘটেনি। কবি বিশ্বম্ভর দাস তাঁর জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে যে সমস্ত লোক-সংস্কৃতির উপাদান জড়ো করেছেন তার অধিকাংশই কবির ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতা ও পাঠ-অভিজ্ঞতার সূত্রে পাওয়া।

লোক - সংস্কৃতির বাক্‌কেন্দ্রিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে ছড়া, ব্রতকথা, রূপকথা, হেঁয়ালি, গান, গল্প ও কিংবদন্তি ইত্যাদি। মৌখিক রীতি-পদ্ধতিতে জন্ম নিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত হয় লোক-সংস্কৃতির বাক্‌কেন্দ্রিক উপাদানগুলি। দীর্ঘ সময় ধরে লোক-সমাজে লোক-সংস্কৃতির বাক্‌কেন্দ্রিক উপাদানগুলি প্রচলিত থাকতে থাকতে কখনও তা সময়ের উপযোগী হয়ে প্রসারিত রূপ লাভ করে, নয়তো কখনও প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে আসে, আবার কখনও সামান্য সামান্য রূপান্তর লাভ করে নতুন হয়ে ওঠে, আবার কখনও কখনও অপ্রচলিত হতে হতে কালচক্রে লুপ্তই হয়ে যায়। কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গলেও লোক-সংস্কৃতির এই নিয়মের খুব বেশি অন্যথা হয়নি। বাংলা মঙ্গলকাব্যের একেবারে আদিপর্বে দেব-কাহিনিগুলি ছিল লোকজীবন থেকে উত্থিত হওয়া মৌখিক সাহিত্য। মৌখিক সাহিত্য থেকে মঙ্গলকাব্যের কাহিনিগুলির জন্ম হওয়ার ফলে মৌখিক সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে মঙ্গলকাব্যের কাহিনিতে উক্ত

বৈশিষ্ট্যগুলি বাহিত হয়েছে। এই কারণেই বাংলা মঙ্গলকাব্যে দেবতা ও কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের জন্মবৃত্তান্ত সাধারণত প্রচলিত জৈবিক পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাদের জন্মকাহিনির সঙ্গে জড়িত থাকে অলৌকিক, অদ্ভুত ও অপ্রাকৃতিক ঘটনা। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় দেবতার আশীর্বাদ, প্রসাদ ও ঔরসে তেজস্বী মানুষের জন্ম হয়। এই রীতির ব্যতিক্রম হয়নি কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গল কাব্যেও। বৈদিক ও পৌরাণিক সূর্য দেবতার কৃপাপুষ্ট মানব সন্তান অবন্তী রাজ্যের মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথমঙ্গলের কাব্যনায়ক। জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে মধ্য-ভারতের অবন্তী রাজ্যের মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান সূর্যের পুত্র হলেও তিনি মাতৃ-পরিচয়হীন ও অযোনীজাত সন্তান। পৃথক ভাবে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের কোনো মায়ের নামোল্লেখ সমগ্র কাব্যে একবারও নেই। জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে নীলমাধবদেবের নবরূপ জগন্নাথের ব্রতদাস মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পরিচয়ে শুধুমাত্র পিতৃপরিচয়ের উল্লেখ রয়েছে –

"কশ্যপের পুত্র হৈলা সূর্য্য মহাশয়।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হৈলা তাঁহার তনয়।।"[২]

শুধুমাত্র রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের জন্মের ক্ষেত্রেই নয়, হলধর বলরামের জন্মপ্রসঙ্গেও দৈব-নিয়ন্ত্রণ জগন্নাথমঙ্গলে বর্ণিত হয়েছে। মথুরার কারাগারে আবদ্ধ দেবকীর সপ্তম গর্ভের সন্তানকে ভগবতী চণ্ডী বসুদেবের অন্য স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তর করেছেন।[৩] গর্ভচালনার এই রীতির উল্লেখ বাংলার লোককাহিনিতেও পাওয়া যায়। বাংলার রূপকথাতেও দেখা যায় ভাবীকালে যে শিশু অমিত ক্ষমতাবলে লোককল্যাণ ও অজস্র অসাধ্যসাধন করবে তার জন্মবৃত্তান্তে সাধারণত একাধিক জটিলতা থাকে। এর ফলে জন্মের পূর্বমুহূর্ত থেকে সেই জাতকের পরবর্তী সময়ে অনন্য হয়ে ওঠার গৌরচন্দ্রিকা শুরু হয়ে যায়। বলরাম পৌরাণিক চরিত্র হলেও কবি বিশ্বম্ভর দাস বলরামের জন্মপ্রসঙ্গে বহুল প্রচলিত এই রীতির সুসম ব্যবহার করে নিজস্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রজাপতি ব্রহ্মার সন্তানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহর্ষি কশ্যপের পৌত্র হলেও তিনি ব্রাহ্মণোচিত নন, বরং তিনি ক্ষাত্রতেজদীপ্ত বীরাচারী পুরুষ। লোক-সমাজে অনেক সময়ই সামাজিক বর্ণবিভাজন ও বর্ণবিভাজিত বিধিব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত একটু শিথিল হয়ে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় এখানে সমাজের মূল ধারার ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক বিধিবিধানের সমান্তরালে লোকসমাজের নিজস্ব বিধিবিধান মেনে চলতে থাকে। সেখানে ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষাত্রগুণ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণ, এমনকি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েতর বর্ণের মধ্যেও এমন প্রচলিত বৈপরীত্য সহজেই দেখা যায়। জন্মবৃত্তান্তে ব্যভিচার বা অন্য খারাপ কিছু জড়িত না থাকলে মিশ্রবর্ণের মানুষের স্বীকৃতিও লোক-সমাজে দেখা যায়। জগন্নাথমঙ্গল কাব্যের প্রধান তিন পুরুষ চরিত্র অবন্তী রাজ্যের মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, অবন্তীর ব্রাহ্মণকুমার বিদ্যাপতি ও ওড্রদেশের শবরপতি বিশ্বাবসুর মধ্যেও এমন দৃষ্টান্ত যথেষ্ট রয়েছে। এই ধারণা একটি সহজ-সরল সমীকরণে মানুষকে দুভাগে বিভাজিত করে—ভালো মানুষ ও মন্দ মানুষ। মানুষের জীবনযাপনের মধ্যে যে পবিত্রতা, সততা, চারুত্ব, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি পুণ্যগুণ থাকে তা মানুষকে উন্নত করে। এই শুভ গুণগুলি যে মানুষের মধ্যে রয়েছে লোকায়ত জীবনধারায় তার সবসময় স্বীকৃতি থাকে। কবি বিশ্বম্ভর দাস তাঁর কাব্যে অন্ত্যজ সমাজের মানুষ শবররাজ বিশ্বাবসুকে অনায়াসে সেই স্বীকৃতি ও মর্যাদার আসন দিয়েছেন। বিশ্বাবসুর প্রাথমিক পরিচয়ে কবি লিখেছেন –

"হেন কালে বিশ্বাবসু বর্ণেতে শবর।
হরির সেবক সেই মহাভক্তবর।।"[৪]

সমস্ত পৃথিবীতে নীলগিরিবাসী শবররাজ বিশ্বাবসুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভগবান বিষ্ণুর আদি সাকার বিগ্রহ নীলমাধবদেবের দর্শন ও নিত্যসেবার সুযোগ অর্জন করেছেন। এমনকি ব্রাহ্মণ হয়েও বিদ্যাপতি শবররাজ বিশ্বাবসুর কৃপাতে নীলমাধবকে প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ পেয়েছেন। তবে এখানে রয়েছে, শবররাজ বিশ্বাবসু আগে থেকেই ভবিতব্য জানতেন। যদি বিদ্যাপতি নীলমাধবদেবের দর্শন পান তবে নীলমাধব যে বিশ্বাবসুর সঙ্গ আপাতত ছেড়ে যাবেন ও পরে জগতের হিতকল্পে অন্যত্র দারুব্রহ্মরূপে প্রকটিত হবেন। মনুষ্যলোকের মধ্যে একমাত্র শবররাজ বিশ্বাবসুই নীলমাধবদেবের প্রকৃত সন্ধান জানতেন। চাইলেই তিনি আত্মসুখ ও ধর্ম সাধনের জন্য নীলমাধবকে সাধারণ লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে পারতেন। কিন্তু বৃহত্তর জনকল্যাণের জন্য নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনের লাভক্ষতির অঙ্ক

ভুলে তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতা নীলমাধব তথা জগন্নাথদেবের নবরূপে প্রকাশের লীলা বিস্তারে স্বেচ্ছায় সহায়তা করেছেন। শবরপতি বিশ্বাবসুর এই মহত্ত্ব তাঁকে ঋষিকল্প পুরুষ করে তুলেছে।

মর্ত্যলোকের মানুষের জীবনে অলৌকিক সংগ্রাম ও লৌকিক ভীষণ সংগ্রামের পর সাফল্য লাভ লোকায়ত রূপকথা ও মিথে সহজলভ্য। কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের জীবনের অভিযাত্রায় পদে পদে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। রাজাসুলভ বিপুল লোকলস্কর, সম্পদ ও আভিজাত্য নিয়ে যখন ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলগিরি পর্বতে ভগবান নীলমাধবের সন্ধান করতে গেছেন তখন দেবতা রাজাকে ছল করে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এভাবে ব্যর্থ হয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বুঝতে পেরেছেন রাজনৈতিক ক্ষমতা, ক্ষমতালব্ধ বাহুবল, রাজোচিত অর্থবল ও এসব থেকে গড়ে ওঠা অগাধ অহংবোধ নিয়ে নীলগিরিতে আগমনের ফলেই তাঁর কপালে দেবদর্শন ঘটেনি। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মধ্যে তৈরি হওয়া এই গ্লানিই তাঁকে ধীরে ধীরে শুদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। তিনি রীতিমতো তপস্যা ও শাস্ত্রসিদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে দেবতার কৃপালাভের যোগ্য করে তুলেছেন। যে ইন্দ্রদ্যুম্ন শুধু রাজা ছিলেন তিনি এই পর্বে এসে যেন রাজর্ষি হয়ে উঠেছেন। তিনি নিরন্তর সৎচর্চার মধ্যে দিয়ে চলেছেন বলে সাক্ষাৎ নারায়ণও যেচে ছদ্মবেশে এসে তাঁকে জাগতিক সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। এমন সৎগুণের জন্যেই তিনি সপার্ষদ জগন্নাথের দিব্যদর্শন লাভ করেছেন এবং অচিরেই দেবতার কৃপায় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার মাধ্যমে শ্রীমন্দিরের নির্মাণ করিয়েছেন। এই দিব্যমন্দিরে জগন্নাথকে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে আরাধ্য দেবতার পূজায় প্রয়াসী হয়েছেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। মানুষের সৎগুণ মানুষকে উন্নত করে, এমন একটি সুন্দর ইতিবাচক ধারণা পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোকসমাজে প্রচলিত রয়েছে। বিশ্বম্ভর দাসের সুচারু প্রচেষ্টায় জগন্নাথমঙ্গল কাব্যময় একটু একটু করে সৎগুণের পরিপূর্ণ আধার হয়ে উঠেছেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর সৎগুণ, সাধনবল ও অর্জিত পুণ্যবলে দেবলোকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত ব্রহ্মলোকে সশরীরে উপস্থিত হতে পেরেছেন। এরপরেই প্রজাপতি ব্রহ্মা হয়ে উঠেছেন পৃথিবীতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়ক। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সশরীরে অমৃতলোকে দেবসমীপে উপস্থিত হওয়ার যেন বাংলা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম যশস্বী চরিত্র সতী বেহুলার সশরীরে স্বর্গগমনের ঘটনা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিরাট বলয়ের মধ্যে একমাত্র সতীগুণের অধিকারী বেহুলার আখ্যানেই এমন অসাধ্যসাধনের আখ্যান পাওয়া যায়। এমন অসাধ্যসাধনগুলির পিছনে লুকিয়ে থাকা মহৎ উদ্দেশের সঙ্গে বাংলার নিজস্ব রূপকথার গল্পের বহিরাঙ্গিক মিল রয়েছে। বাংলা রূপকথার চরিত্রেরা লক্ষ্য পূরণের জন্য কখনও দেবলোকে তো কখনও রাক্ষসলোকে, আবার কখনও কল্পিত অন্য কোনো ভুবনে উপস্থিত হয়। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের ক্ষেত্রেও এমন ঘটিয়েছেন কবি বিশ্বম্ভর দাস। যুগে যুগে মুক্তিপ্রদ জগন্নাথ অকাতরে মর্ত্যের মানুষের উদ্ধার করতে এই কল্পে শ্রীমন্দিরে স্থিতি নেবেন এবং সেই মহৎ লোককল্যাণের প্রসারক হতে চলেছেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। এ কি কম কথা! তাই পুরাণকথাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম না করে একটু স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে ইন্দ্রদ্যুম্নের অভিযাত্রায় এমন অসাধ্যসাধনের ইতিবৃত্ত তৈরি করে দিয়েছেন কবি বিশ্বম্ভর দাস।

বাংলার রূপকথায় জেষ্ঠের চেয়ে কনিষ্ঠের জয়লাভ বা কীর্তির জয়গান দেখা যায়। এই রীতিটি মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলেও অপ্রতুল নয়। কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে দেখা গেছে, মর্ত্যলোকে বিষ্ণুর সাকার আদিবিগ্রহ যে নীলমাধব দেবতার দর্শন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের ক্ষেত্রে রাজাসুলভ বিরাট আয়োজনের পরেও শেষ পর্যন্ত ঘটতে পারেনি, সেই নীলমাধবকেই ইন্দ্রদ্যুম্নের আগে তাঁর কনিষ্ঠ-ভ্রাতাসম বিদ্যাপতি সহজে দর্শন করেছেন, দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে স্তুতিবন্দনা করেছেন, শেষে আরাধ্য দেবতার দিব্যপ্রসাদ লাভ করেছেন। কনিষ্ঠের সৌভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের তুলনা করে ইন্দ্রদ্যুম্নের মনে বিষাদ জেগে উঠেছে। বিষাদ ও বিগত অহংবোধ থেকে জন্ম নেওয়া গ্লানি তাঁকে ভীষণভাবে মর্মাহত করেছে। বিশেষত কনিষ্ঠ বিদ্যাপতির নীলমাধব দর্শনের ঠিক পরেরদিনই দেবতা অন্তর্ধান করায় ইন্দ্রদ্যুম্নের বিষাদের মাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে।[৫] তবে এরপরেও বিদ্যাপতির প্রতি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের হিংসা বা ক্ষোভ বা ঈর্ষা তৈরি হয়নি। ভাবীকালে যে ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাবেন তাঁকে কবি বিশ্বম্ভর দাস অতি যত্নে মার্জিত রুচি ও মেজাজে সাজিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন।

কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে লোক-সংস্কৃতির বস্তুকেন্দ্রিক উপাদান অপেক্ষাকৃত আরও বেশি রয়েছে। লোকায়ত খাদ্য, পোশাক, প্রসাধন, গৃহস্থালির উপকরণ, যানবাহন, বাদ্য ইত্যাদির বিবিধ প্রয়োগ দেখা গেছে এখানে। বাঙালির সংস্কৃতিতে খাদ্যের বৈচিত্র্য রয়েছে প্রাচীন সময় থেকে। একই উপাদানকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করে নতুন নতুন ভোজ্য পদসৃষ্টিতে বাঙালি নারীর জয়জয়কার হয়েছে প্রাচীন সময় থেকে। বাঙালির আরাধ্য দেবতারা তাদের মতোই ভোজনরসিক। তাই বাঙালির দেব-উপাসনার অন্যতম উৎকৃষ্ট উপকরণই হলো আরাধ্য দেবতার আহারের জন্য তৈরি করা রকমারি ভোগরাগ। বাঙালির পছন্দের পদগুলি সহজেই দেবতার সেবায় নিয়োজিত হয়েছে। নিজের পছন্দের ভোজ্যপদটি আরাধ্য দেবতাকে উৎসর্গ করে তারপর তা প্রসাদরূপে খাওয়ার মধ্যে তাদের ভক্তিমিশ্রিত দিব্য-আনন্দ রয়েছে। বহু শতাব্দী ধরে উৎকলেশ্বর মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের ভোজনরসিক স্বভাবটি সর্বভারতে পরিচিত। সেই জগন্নাথদেবের ভোগের জন্য বাঙালির পছন্দের ভোজ্যের সম্ভার সাজিয়ে দিয়েছেন কবি বিশ্বম্ভর দাস। ভগবতী লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গার তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে জগন্নাথের যাবতীয় ভোজ্য-ব্যঞ্জন। সেই তালিকায় রয়েছে নানা রকমের শাকভাজা, মানকচু বাটা, নারকেলের ভেতরের অঙ্কুরিত ফুল বাটা, একসঙ্গে পাতলা পাতলা করে কেটে মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে আলু ভাজা, অনেক রকমের দেশি সবজি একসঙ্গে মিশিয়ে সুক্তোর ঝোল, নারকেলের রস চেপে বের করে সেই সাদা দুধের মতো নারকেলের রস দিয়ে কুমড়োর তরকারি, ভাজা মশলার পুর ভরে কাঁচকলার তরকারি, ছোট ছোট করে কলাগাছের মধ্যকার থোড় কেটে ঘিতে ফেলে সেই থোড় ভাজা, আলু ভাজা, ডুমো ডুমো আলু দিয়ে মানকচুর তরকারি, মুগের ডাল, মাষকলাই-এর ডাল, কাঁচা আমের টক-মিষ্টি অম্বল, মুখের স্বাদবৃদ্ধির জন্য লেবু সহ নানারকম স্বাদের আচার, ভেজানো মুগ ডাল আর মাষকলাই ডাল মিহি করে বেটে সেই বাটা দিয়ে আলাদা আলাদা করে গরম ঘিতে ভাজা মুগ আর মাষকলাই ডালের বড়া, উনানের আঁচে সেকা হাতে তৈরি রুটি, গরুর দুধের তৈরি ঘন দই, নানারকম বাঙালি পিঠা, পায়েস ও সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, শর্করার তৈরি শুকনো কদম্ব, ঘিয়ে ভাজা চিঁড়ে, দুধের সর ভাজা, শর্করায় ভেজানো রসকরা, সাদা তিল আর গুড়ের তৈরি কড়া পাকের নাড়ু, দুধ কাটিয়ে তা থেকে তৈরি করা মিঠে ছানা, বিভিন্ন রকমের পদ্ধতিতে হাতে বানানো ভাজা-ভেজা-শুকনো মিঠাই ইত্যাদি। এছাড়াও জগন্নাথের ভোগে ব্যবহৃত হয়েছে অজস্র ভারতীয় ফল।[৬] জগন্নাথের সেবায় নিবেদিত রান্না করা প্রতিটি পদই নিরামিষ। এগুলির অধিকাংশই বাঙালির লোক-জীবনের অতি পরিচিত খাদ্য। প্রজন্ম পরম্পরায় এই তালিকাভুক্ত অধিকাংশ ভোজ্য এত শতাব্দী অতিক্রম করে আজও বাঙালি সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

জগন্নাথমঙ্গলে বাঙালির নিজস্ব খাদ্য-সংস্কৃতির বিপুল বৈচিত্র্য থাকলেও পোশাক, পরিচ্ছদ, প্রসাধনের তেমন বৈচিত্র্য নেই। নারায়ণ-স্বরূপ জগন্নাথ, আর্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতির পোশাক-পরিচ্ছদে সেই অর্থে লোকায়ত ছাপ নেই। তৎকালীন সমাজের উচ্চ স্তরের বেশভূষাতেই সেজে উঠেছেন তাঁরা। পৌরাণিক দেবচরিত্রের পোশাকেও প্রচলিত রূপই ধরা পড়েছে। শবররাজ বিশ্বাবসুকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের পদে কবি বরণ করেছেন। হয়তো এর ফলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাবসুকে তিনি প্রচলিত স্বাভাবিক শবরসজ্জায় সাজিয়ে তুলতে চাননি। তবে জগন্নাথমঙ্গলে একটু হলেও বৈচিত্র্য রয়েছে বৃন্দাবনী গোপ সম্প্রদায়ের গোষ্ঠযাত্রার পোশাকে। গোষ্ঠে যাওয়ার আগে নবীন গুঞ্জাফুলের মালা, অলকা তিলক, গোষ্ঠের বেত, শিঙা, বাঁশিতে সেজেছেন কৃষ্ণ-বলরাম ও তাঁদের ঘিরে থাকা শ্রীদাম-সুদাম প্রমুখ সখারা সেজেছেন প্রায় কৃষ্ণ-বলরামের অনুসঙ্গে। তবে এতজন গোপবালকের মধ্যে একমাত্র বলরামের হাতে রয়েছে বারুণী মদের পাত্র। গোষ্ঠে যাওয়ার সময় তাঁরা সবাই পরেছেন কোমর পর্যন্ত রাঙা কাপড়।[৭] অন্যদিকে গোপবধূরা সেজেছেন নানা রকমের রঙিন কাপড়ে, তাঁদের প্রত্যেকের কাঁখে দুধ-দধির পসরার ভাণ্ড, গলায় কনকমালা ও বনমালা। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী শ্রীময়ী রাধারাণী। সারাবেলা পরিশ্রম করতে হয় বলে তাঁরা পথে খাওয়ার জন্য নিজের সঙ্গে পরিমিত খাদ্য বহন করেন। আবার প্রয়োজন হলে নিজে অভুক্ত থেকে তা দিয়ে অভ্যাগতের ক্ষুধাও শান্ত করেন।[৮] কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে কাষ্ঠশিল্পী সূত্রধর বাসুদেব রাণাকে দেখা গেছে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আরাধ্য দেবতাই স্বয়ং বৃদ্ধ বাসুদেব রাণার ছদ্মবেশে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন।[৯] সূত্রধর বাসুদেব রাণার সাধারণ পোশাক, হাতে জীর্ণ লাঠি। তিনি বয়সের ভারে সামনের দিকে নুয়ে পড়েছেন। তবু তাঁর শিল্পের হাত নষ্ট হয়নি। এখানে বাসুদেব রাণা

স্বরূপত দেবতা হলেও তিনি তৎকালীন সমস্ত শ্রমজীবী ও শিল্পী মানুষের প্রতিভূ, যাদের হাতে তৈরি হওয়া উৎকৃষ্ট শিল্পই মহাকালকে অতিক্রম করে তাদের একমাত্র ধ্রুব পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ সেই শিল্পী হারিয়ে গেছেন মহাকালের বিরাট গর্ভে।

বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে একাধিক প্রসঙ্গে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অভিযাত্রায় রাজকীয় যাত্রারীতির বর্ণনা রয়েছে ও জগন্নাথের আষাঢ় মাসের প্রখ্যাত দেব-রথযাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু কাব্যে কোনো লৌকিক জলযান বা স্থলযানের উল্লেখ নেই। তবে নিম্নবর্গের লোকায়ত মানুষের পদযাত্রার ছবি ধরা পড়েছে বিদ্যাপতি, বিশ্বাবসু ও প্রিয়ম্বদের অভিযাত্রায়।

বাঙালি সমাজের বিভিন্ন আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যয়বহুল আয়োজনের মধ্যে অন্যতম আমোদের বিষয় ছিল মূলধারার ও লৌকিক বাদ্য বাজানো। জগন্নাথমঙ্গলে জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সমারোহের অনুষ্ঠানে একাধিক বাদ্য বাজিয়ে আনন্দ ঘোষণার উল্লেখ রয়েছে। সেখানে মঙ্গলগীতের সঙ্গে লোকায়ত বাদ্য মুরজ, ভেরী, কাহাল যেমন বেজেছে তেমনই বেজেছে শাস্ত্রীয় ধারার বাদ্য শঙ্খ ও বীণা।[১০] মহাদেব শিবের বিবাহের দৃশ্যে রয়েছে বরযাত্রীর সঙ্গে বাদ্যকররা শঙ্খ, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝরি, ঢেমচা, মোচঙ্গ, সামা, খমক, খঞ্জরী, মুরজ, চর্চরী, দগড়, মাদল, ডম্ফ, জয়ঢাক, কাড়া, মন্দিরা, বেণু, বীণা, শিঙা প্রভৃতি নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বরযাত্রীদের আমোদ দিয়েছেন।[১১] এর সঙ্গে দেবাদিদেব শিব নিজেই নিজের বিয়ের আনন্দে বাজিয়েছেন ডমরু। এই দীর্ঘ বাদ্যযন্ত্রের তালিকার মধ্যকার অধিকাংশই লৌকিক বাদ্য। এই সবকিছুর মধ্যে বিশেষ করে শঙ্খবাদন বাঙালির মূলধারা ও লৌকিক উভয় ধারার মঙ্গলকর্মের সঙ্গেই প্রাচীন সময় থেকে আজও জুড়ে রয়েছে। এখনও বাঙালির নারীসমাজে ব্রত-পার্বণ, স্ত্রী-আচারে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দেওয়ার রীতি রয়েছে। বাঙালি সমাজে প্রচলিত এই রীতিটি কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গলেও দেখা গেছে শিব-গৌরীর বিবাহের দৃশ্যে।[১২] অনুমিত হয় যে, কবি বিশ্বম্ভর দাস সমকালীন বাংলার বাঙালির বিবাহের সমারোহের ছবিই গৌরী-শিবের বিবাহপ্রসঙ্গে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। বাঙালির সংস্কৃতিতে বাদ্য সহযোগে বিবাহের দৃশ্য বাঙালির আদিসাহিত্য চর্যাপদেও নাতিদীর্ঘ পরিসরে দেখা গেছে।[১৩] বলাবাহুল্য চর্যাপদের সময় থেকে একবিংশ শতাব্দীর এই প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালির বিবাহে ব্যবহৃত বাদ্য সমূহ শুধুমাত্র স্বরূপ বদলেছে। এখন শাস্ত্রীয় ও লৌকিক গীত-বাদ্যের বদলে এসেছে তথাকথিত আধুনিক পাঁচমিশালি সঙ্গীত ও যন্ত্রানুসঙ্গ সমেত আধুনিক বাদ্য। বাঙালির বিবাহকেন্দ্রিক এই লোকায়ত বিষয়ে নাগরিক প্রসাধন বাহ্যত লাগলেও স্ব-সংস্কৃতির রীতি থেকে আধুনিক বাঙালি সম্পূর্ণ সরে যেতে পারেনি। শুধু কালের নিয়মে এর ধরন অনেকটা বদলে গেছে।

প্রাগাধুনিক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা সেভাবে প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। অসংখ্য লোকবিশ্বাস ও সংস্কার এই সময় সাধারণ মানুষ মেনে চলত। এই বিশ্বাস বা সংস্কারগুলি তারা কেন বহন করে চলেছেন তার উত্তর ছিল তাদের কাছেই অজানা! প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে উত্তরাধিকার সূত্রে এই সব বিশ্বাস ও সংস্কার তারা বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচার-বিশ্লেষণ করে শুধুমাত্র নিয়মিত বহন করে চলেছেন। মানুষের সভ্যতার বিকাশের এক এক পর্বে এগুলির কিছু কিছু যুক্ত হয়েছে, কিছু কিছু অপ্রচলিত হয়ে শেষমেশ লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে এসব এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বয়ে চলার পিছনে ছিল অজ্ঞেয় জীবনে বহু কাঙ্ক্ষিত মঙ্গলের প্রতি সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক হাতছানি। মানুষের বস্তুজীবনে সমস্যা ও দুঃখের শেষ নেই, এই সত্যি জেনেও মানুষ প্রতিদিন সমস্যাহীন ও সুখী জীবনের প্রত্যাশা রাখে। শুভ-অশুভ, হিত-অহিত, ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের বোধ থেকে বহুক্ষেত্রে কিছু রীতি রেওয়াজ মানুষ শুধুই কালে কালে বহন করে এসেছে। এসব মেনে চলার রীতিনীতি শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শিষ্ট-অশিষ্ট, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ কমবেশি সবার মধ্যেই স্বাভাবিক সংস্কারের বশে প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল এগুলি মান্য না করলে জীবনে বিপর্যয় অবশ্যই ঘটবে এবং সেই বিপর্যয় তারা একা একা নিজেরা সামাল দিতে পারবে না। এগুলি তৎকালীন সমাজ-ইতিহাসের দলিল। কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গলে এই ধরনের অজস্র রীতি, বিশ্বাস ও সংস্কারের উল্লেখ রয়েছে। সেই সময় মানুষ কোনো শুভ কাজ শুরু করার আগে দেবতার বন্দনা করতেন। জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর সাকার বিগ্রহ নীলমাধবদেবের দর্শনে গমনের আগে রাজোচিত অভিষেকের

পর বৈদিক শ্রীসূক্ত, অনলসূক্ত ও বরুণসূক্ত পাঠ করেছেন।[১৪] সেই সময় যাত্রার আগে দেবদর্শন ও দেবী দুর্গাকে স্মরণের রীতি ছিল। বাঙালি হিন্দু সমাজে লোকবিশ্বাস রয়েছে বিশেষ তিথি নক্ষত্র মেনে কোনো শুভ তিথিতে বা যোগে কোনো শুভ কাজে অগ্রসর হলে সেই কাজের পথে থাকা সমস্যা কেটে গিয়ে কাজে সাফল্য আসে। জগন্নাথমঙ্গলে দেখা গেছে, দৈবজ্ঞ পণ্ডিতদের ডেকে এনে শ্রীক্ষেত্রযাত্রার দিনক্ষণ আগে থেকেই স্থির করা হয়েছে –

"ক্ষেত্রযাত্রা নিরূপণ দৈবজ্ঞ করিল।।
জ্যৈষ্ঠ শুক্ল সপ্তমীতে পুষ্যা শুক্রবার।
এইদিন নিরূপিলা করিয়া বিচার।।"[১৫]

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার তিথি প্রায় একইভাবে নির্ধারিত হয়েছে মহাপ্রভু জগন্নাথের আবির্ভাবের পবিত্র তিথি হিসেবে। প্রাচীন সময়ে মানুষ দৈবের ওপর বিশ্বাস করত। মানুষ সমাজে প্রচলিত সাধারণ সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য যথাসম্ভব মেনে চলত। সেই সময় মানুষের বিশ্বাস ছিল দৈব অলঙ্ঘনীয়। মানুষ ভাবত এই অলঙ্ঘনীয় দৈবকে কর্মফল দিয়ে গুরু থেকে লঘু করা যায় কিন্তু তা সম্পূর্ণ এড়ানো যায় না। কর্মফল ভুগতেই হয়। তাছাড়া মানুষের অজ্ঞাত দৈবের বিরোধিতা সবসময় করতেও চাইত না। অজ্ঞাত সেই দৈবকে বহুক্ষেত্রেই প্রায় বিনা সংঘর্ষে মানুষ মেনে নিত। বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গলে রয়েছে, শবররাজ বিশ্বাবসু অনেক আগে থেকেই জানতেন নীলমাধব একদিন তাঁকে ছেড়ে যাবেন ও নীলমাধবই আবার মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সাধনে নবরূপ ধরে প্রকাশিত হবেন। ভবিতব্য জানা সত্ত্বেও এবং যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও বিশ্বাবসু এই দৈবকে স্বেচ্ছায় অতিক্রম করতে চাননি, বরং তিনি নীলমাধবকে অচিরেই হারানোর মতো মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও স্মরণ করেছেন দৈবের পূর্বনির্ধারিত ভাবী সময়ের ঘটনাবলীকে –

"শুনিয়া শবররাজ হইল বিস্ময়।
এতদিনে বুঝি ত্যেজিলেন দয়াময়।।
বিশ্বাবসু মনে হৈল পূর্ব বিবরণ।
সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন হবেন রাজন।।
মহাভক্তিমান রাজা আসিয়া এখানে।
করিবে সহস্র যজ্ঞ হরির তোষণে।।
নীলরূপী নারায়ণ হবে অন্তর্ধান।
পুনঃ দারুরূপে প্রকটিবে ভগবান।।
অগ্রেতে গমন করি তার পুরোহিত।
মাধব দেখিয়া তারে করিব বিদিত।।"[১৬]

এত সমস্ত দৈব পরিকল্পনা আগে থেকেই জানতেন বলে একমাত্র শবররাজ বিশ্বাবসুর কাছেই সুযোগ ছিল এর প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করার। তিনি চাইলেই ব্রাহ্মণকুমার বিদ্যাপতির কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখতে পারতেন বা শবররাজ্যের অধিপতি হিসেবে স্ব-সিদ্ধান্তে ক্ষমতাবলে বিদ্যাপতিকে কারারুদ্ধ করে রাখতে পারতেন। শবররাজ বিশ্বাবসুর অমতে ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিও তবে নীলমাধব দেবতার দর্শন ও অবস্থান-ভূমি এত দ্রুত জানতে পারতেন না। এত সুন্দর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পূর্বনির্ধারিত দৈবের কোনো পরিবর্তন করতে চাননি বিশ্বাবসু শবর। বরং জগন্নাথমঙ্গলে রয়েছে বিশ্বাবসুর অসাধারণ অতিথি পরায়ণতার দৃশ্য। এই কারণেই ব্রাহ্মণকুমার বিদ্যাপতি খুব অনায়াসে শবররাজ বিশ্বাবসুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে পেরেছেন এবং এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় শবররাজের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষোভ বা বিষাদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। শবররাজও কঠিন ভবিতব্য বিদ্যাপতির কাছে বলেননি।[১৭]

তৎকালীন লোকায়ত সমাজে সাধারণ মানুষের ব্রাহ্মণ ও রাজার প্রতি যথেষ্ট আনুগত্য ছিল।[১৮] জগন্নাথমঙ্গলের এই ছবিগুলি প্রকারান্তরে মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে প্রচলিত ব্রাহ্মণপূজা ও রাজপূজার নামান্তর মাত্র। সেই সময় সাধারণ মানুষ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অনেক অপসংস্কার মেনে চলত। জগন্নাথমঙ্গলে রয়েছে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীক্ষেত্র গমনান্তরে বারবার বাঁ চোখ কাঁপতে শুরু করেছে। বাঁ চোখ হঠাৎ করে বিনা কারণে একটানা কাঁপলে তা

অমঙ্গলসূচক মনে করা হতো।[১৯] নীলমাধব দর্শনের প্রাক্ মুহূর্তে হঠাৎ করে বাঁ চোখ কাঁপতে শুরু করলে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নও মনে মনে ভীত হয়ে পড়েছেন। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপসংস্কারের ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে, এত ক্লেশ করে এত ব্যয় করে এতজন মিলে এতদূর এসেও নীলগিরি পর্বতে ভগবান নীলমাধবদেবের বিগ্রহের দর্শন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পেলেন না। সমাজে এমন বহুল প্রচলিত অপসংস্কার, অনাকাঙ্ক্ষিত অঘটন ও বিপর্যয়কে মানুষ আশা দিয়ে অতিক্রম করতে চাইত। এখানেও তেমনই দেখা গেছে। বারবার বাঁ চোখ কাঁপতে থাকা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে উপস্থিত সকলে সান্ত্বনা দিয়েছেন –

"শুন রাজা বিষাদ না ভাবিহ অন্তর।
অল্প বিঘ্ন শুভ তব হইবে বিস্তর।।
ভাগ্যবান যেই জন হয় নরবর।
শুভ পুনঃ মিলে তারে বিঘ্নের অন্তর।।"[২০]

জগন্নাথমঙ্গলের এই অংশে লোকসংস্কারের সুন্দর পরিপোষণ হয়েছে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিপুল সমারোহ করে বিদ্যাপতির দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত দেবস্থানে উপস্থিত হয়েও সম্পূর্ণ খাতি হাতে ফেরার পথ ধরেছেন আশায় বুক বেঁধে। এমন মানসিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ার মুহূর্তে উপস্থিত প্রিয়জনদের কাছে পাওয়া আশাবাদ তাঁকে বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছে। উপস্থিত জনতার কাছে পাওয়া এই ক্ষীণ আশা তাঁকে স্থির হতে সাহায্য করেছে, এমনকি সঞ্চারিত এই আশাবাদই পরবর্তী সময়ে তাঁকে নিরন্তর সৎচর্চার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতই জগন্নাথ দর্শনের অধিকারী করে তুলেছে। মর্ত্যলোকে দারুব্রহ্মরূপে জগন্নাথের প্রকাশের কাজের প্রধান কাণ্ডারী হয়ে উঠেছেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। এছাড়াও জগন্নাথমঙ্গলে দেখা গেছে আরও কয়েকটি সামাজিক সংস্কার বা ধারণা। যেমন— সেই সময় সমাজে মদ্যপান ও পতিতালয় গমন নিন্দনীয় ছিল।[২১] যত্রতত্র প্রকাশ্যে মদ্যপান ও পতিতা বিলাসে মত্ত থাকা মানুষকে সমাজে ভালো চোখে দেখা হতো না। সমাজের পদস্থ বা বিত্তবান পুরুষের মধ্যে এই অপগুণ থাকলে তাঁকেও প্রচলিত ছকে স্বাভাবিক নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হতো। শুধুমাত্র পতিতাগমনই নয়, নারী-পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত পরকীয়া সম্পর্ককেও সমাজে ভালো চোখে দেখা হতো না। এগুলিকে সমাজ বিশৃঙ্খলার উপকরণ ভাবা হত। এছাড়াও তৎকালীন সমাজে নারীনিগ্রহ, নারীহত্যা, গোহত্যা ও ব্রাহ্মণহত্যাকে পাপ মনে করা হতো।[২২] মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে গোধন ছিল স্থাবর সম্পদ। এছাড়াও গাভীর সঙ্গে মানুষের ধর্মবোধ জড়িত ছিল। বাঙালির এই গোসম্পদকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী সময়ে রাঢ়বঙ্গের বিশেষত মল্লভূত অঞ্চলে রচিত হয়েছিল কপিলামঙ্গল কাব্য। এছাড়াও তৎকালীন সমাজে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ভেদে সব পুরুষেরই ব্রহ্মচর্য ধারণ ও রক্ষা করা ছিল অনেক সম্মানের বিষয়।[২৩] এছাড়াও সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল তীর্থযাত্রা, তীর্থবাস, তীর্থস্থানের মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ এমনকি তীর্থচিন্তা করলেই পুণ্য ফল পাওয়া যায়।[২৪] তীর্থপতি দেবতার যে কোনো পদ্ধতিতে অনুধ্যানকেও ফলপ্রদ মনে করা হতো।[২৫]

লোকায়ত জীবনে বহু প্রজন্ম ধরে প্রচলিত থাকা বিভিন্ন প্রথা সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম থেকে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এর মধ্যে সাধারণ আচার ও স্ত্রী-আচার উভয়ই রয়েছে। কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে সেই সময়ের সমাজে প্রচলিত সাধারণ আচারের মধ্যে রয়েছে গৃহস্থজনের ভদ্রাসনে আগত অতিথিদের যাবতীয় সম্মানজ্ঞাপন ও তুষ্টিবিধানের কথা। অতিথি অভ্যাগতদের দেবতার সমান মনে করা হত। মানুষের বিশ্বাস ছিল অতিথি সাক্ষাৎ নারায়ণ। অবশ্য প্রাচীন ভারতের উপনিষৎও এই ধারণাটির পোষণ করে। ভারতে প্রাচীন সময় থেকেই অতিথি দেবতার মর্যাদায় ভূষিত। এই সামাজিক রীতি ধনী-দরিদ্র সবার পরিবারেরই কমবেশি মেনে চলা হত। দরিদ্র শবররাজ বিশ্বাবসুর গৃহে বিদ্যাপতি সাময়িক আতিথ্য গ্রহণ করতে উপস্থিত হলে, শবররাজ বিশ্বাবসু সানন্দে বিদ্যাপতিকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করে বলেছেন, "অতিথি পাইনু বড় ভাগ্য সে আমার।"[২৬] শুধুমাত্র শবররাজ বিশ্বাবসুই নয়, কাব্যে দেখা গেছে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কৃত অনুষ্ঠানে আগত বিভিন্ন বর্ণের মানুষ অতিথি রূপে উপস্থিত হলে তিনি তাদের প্রত্যেককে যথাযথ আদর-আপ্যায়ণ ও যথোপযুক্ত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়েছেন।[২৭] এই দৃশ্যে রাজকীয় বৈভবের যে চিত্র দেখা গেছে তা হয়তো কবি বিশ্বম্ভর দাসের সমকালীন বাংলার বিত্তশ্রেষ্ঠ মানুষের অতিথি সৎকারের ছায়ামাত্র। সাধারণ

লোকচারের মধ্যে পড়ে সামাজিক শিষ্টাচার। সমাজে প্রচলিত স্বাভাবিক সভ্যতা, ভব্যতা ও পারস্পরিক সৌজন্য প্রকাশের ক্ষেত্রটি নির্মিত হয় মান্য শিষ্টাচারের হাত ধরে। জগন্নাথমঙ্গলে রয়েছে, অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে উৎকলপতি উপস্থিত হয়ে তাঁকে সাদরে প্রণাম জানালে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সঙ্গে সঙ্গে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন উৎকলপতিকে প্রতি নমস্কারে সাদরে প্রীতি সম্ভাষণ করে আলিঙ্গন করেছেন। দুই রাজার মিলনের এই দৃশ্যে প্রচলিত শিষ্টাচারের এখানেই শেষ নয়, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আগে নিজের বসার আসনে উৎকলপতিকে সাদরে বসিয়েছেন তারপর উৎকলপতির কাছে নীলমাধবের বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করেছেন।[২৮] উৎকলপতি অবন্তীরাজের কাছে সেই আচরণ পেয়েছেন যা সত্যিই একজন মার্জিত ও শিষ্ট মনোভাবাপন্ন যশস্বী রাজার কাছে আর একজন যশস্বী রাজা স্বাভাবিক প্রত্যাশা রাখেন। উৎকলের রাজার প্রতি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের এই আচরণ তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়। অবন্তীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কোনো প্রয়োজনে উৎকলে এসে উপস্থিত হয়েছেন জানতে পেরে স্বয়ং উৎকলপতি লোক না পাঠিয়ে নিজে ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে যেচে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন শুভ সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে আত্মীয়-পরিজন ও সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানোর রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত আমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ণেও শিষ্টাচার মেনে চলা হতো, সতর্ক ভাবে দেখা হত তাঁদের যেন কোনো অমর্যাদা না হয়ে যায়। শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের জন্য নাট্য-গীত-বাদ্যের মাধ্যমে সাময়িক সময়ের বিনোদনের ব্যবস্থা করার লৌকিক প্রথা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল।[২৯]

বাঙালির লোকাচারের বলয়ে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বাঙালির উৎসব-পার্বণে বিশেষত নারীসমাজে প্রচলিত স্ত্রী-আচারগুলি। বাঙালি সমাজে প্রচলিত স্ত্রী-আচারগুলির পরিচালনা করে মূলত নারীরাই। এগুলি শাস্ত্রবদ্ধ নীতি-নিয়ম নয়। এগুলি নারী সমাজের নিজস্ব সম্পদ। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রবিধির সঙ্গে প্রায় পাশাপাশি চলে এসেছে অজস্র লৌকিক স্ত্রী-আচার। পূজা, ব্রত, পার্বণ, বিবাহ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বাঙালি নারীসমাজে প্রচলিত রয়েছে একাধিক স্ত্রী-আচার। কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গলে এসবের মধ্যে শুধুমাত্র জন্ম ও বিবাহকেন্দ্রিক স্ত্রী-আচারের নাতিদীর্ঘ বিবরণ রয়েছে। জগন্নাথমঙ্গলে রয়েছে, নবজাতকের সংবাদ পেয়ে গোপ সম্প্রদায়ের নারীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রায় নেচে উঠেছেন। তারা মনের আনন্দে তেল, দই ও হলুদ ছড়িয়ে বেরিয়েছেন সর্বত্র। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকসংস্কার রয়েছে যে কোনো শুভ কাজের সময় তেল, দই ও হলুদ গড়ানো বা ছড়ানো সেই কাজে শুভফল প্রদান করে এবং সেই কাজে যদি কোনো আধিদৈবিক-আধিভৌতিক বাধা থেকে থাকে তাহলে সেই দোষ শুভ সামগ্রীর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে যায়। বাঙালির স্ত্রী-আচারের বলয়ে এই তিনটি উপকরণ অত্যন্ত শুভ হিসেবে মান্যতা পেয়েছে। তবে একটু গভীর অনুধ্যানেই স্পষ্ট ধরা যায় যে, বাঙালির স্ত্রী-আচারগুলির অধিকাংশ উপকরণই সহজলভ্য। নবজাতকের জন্মকেন্দ্রিক স্ত্রীআচারে তার ব্যতিক্রম নেই। তেল, দই ও হলুদ এই তিনটি উপকরণই নারীসমাজের তত্ত্বাবধানে থাকা রান্নাঘরে বেশ সহজলভ্য। ফলে নবজাত শিশুর জন্মের সঙ্গে শুভভাব যুক্ত করে নেওয়া ও নবজাতকের মঙ্গলবিধানের জন্য সধবা নারীরা এই তিনটি উপকরণ ছড়িয়েছেন। তারা নবজাত শিশুর মুখদর্শন করে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করেছেন। নবজাত শিশুকে দেখে অত্যন্ত স্নেহের ভাব নিয়ে শিশুর জয়জয়কারে উলুধ্বনি করেছেন উপস্থিত পুরনারীরা।[৩০] নবজাতকের জন্মের পর শিশুর নামকরণ করার রীতির উল্লেখ রয়েছে কাব্যে। এরপর নবজাতকের কর্ণবেধ সহ অন্যান্য কুলাচারও যথানিয়মে পালিত হয়েছে। জগন্নাথমঙ্গলের বিবাহের দৃশ্যে আরও কয়েকটি স্ত্রী-আচারের উল্লেখ রয়েছে। বিবাহের ঘটনায় রয়েছে, বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত পুরনারীরা বরযাত্রীর আগমনের পর জয়সূচক উলুধ্বনি দিয়ে হবু বরকে বরণ করে নিয়েছেন, বিয়ের অনুষ্ঠানে নানা বাজনা বাজিয়ে বিয়ের গান গেয়েছেন, মঙ্গল বিধানের জন্য ঘি দিয়ে সাতাশ দীপকাঠি জ্বেলেছেন, বিয়ের পর বাসরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগরণ করেছেন।[৩১]

কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গলের বিভিন্ন টুকরো টুকরো কাহিনিতে একাধিক লোকায়ত বৃত্তি বা পেশার উল্লেখ রয়েছে। অভিজাত সমাজের মানুষেরা এই বৃত্তিগুলির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও নিজেদের কোনো বিশেষ কার্যসাধনের জন্য এই সব লোকবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকা মানুষের ব্যবহারিক পোশাক পরিচ্ছদ ধারণ করে তারা ছদ্মবেশ নিয়েছেন। এমনটি দেখা গেছে ছদ্মবেশী বিশ্বকর্মার ক্ষেত্রে। অবন্তী রাজ্যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের দারুবিগ্রহ নির্মাণের

কাজে বহু চেষ্টার পরেও অসমর্থ থাকলে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা লাঠিতে ভর দিয়ে বৃদ্ধ সূত্রধরের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়েছেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে।[৩২] জগন্নাথমঙ্গলে গোয়ালিনীর পেশায় যুক্ত থাকতে দেখা গেছে বৃন্দাবনী গোপ সম্প্রদায়ের নারীদের,[৩৩] অক্রূরকে দেখা গেছে রাজার রথের সারথি বা গোড়ায়ানের ভূমিকায়।[৩৪] রাজার দেহরক্ষক তথা কুটিল কাজের সহায়কের কাজে যুক্ত থাকতে দেখা গেছে মুষ্টিক-চাণুর নামের দুজন ভীষণকায় মল্লযোদ্ধাকে।[৩৫] আবার দেবর্ষি নারদকে দেখা গেছে শিব-গৌরীর বিবাহের ঘটকের ভূমিকায়।[৩৬] কাব্যে রয়েছে নারীদের মাধ্যমে দেবপূজার প্রসঙ্গ। নারীরা শুধুমাত্র ভক্তিকে আশ্রয় করে পূজকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের এই প্রচেষ্টা সফলও হয়েছে আরাধ্য দেবতার প্রসন্নতা লাভের মধ্যে দিয়ে।[৩৭] এছাড়াও বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে বাদ্যকর ও গায়েনের পেশার উল্লেখ রয়েছে। এই সব ছোট্ট ছোট্ট পেশার মানুষের সঙ্গে জড়িত থাকা দৃশ্যগুলি কাব্যের কাহিনির শ্রীবৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে। জগন্নাথমঙ্গল কাব্যে রূপকথাসুলভ মনুষ্যেতর প্রাণীদের মানুষের ভাষায় কথা বলার দৃশ্য রয়েছে।[৩৮] কাব্যে রয়েছে ভগবতী চণ্ডী দেবী দেবকার্য সাধনের জন্য একবার শৃগালের ছদ্মবেশ নিয়েছেন।[৩৯] এই কাব্যে দেবতাদের একাধিক ছদ্মবেশ ধারণের প্রসঙ্গ থাকলেও মনুষ্যেতর প্রাণীর ছদ্মবেশ ধারণের প্রসঙ্গ এটি ছাড়া আর নেই। জগন্নাথমঙ্গলে রূপকথার দেশের অতি পরিচিত দৃশ্য— ধাতুময় পাহাড়ের একবার বর্ণনা রয়েছে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলাচলের পথে যাত্রাকালে নীলাচলের কাছে এসে চিত্রোৎপলা মহানদীর তীরদেশে ধাতুময় পাহাড় দেখেছিলেন।[৪০]

কবি বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গল কাব্যের প্রধান আখ্যান অংশটি স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডের অন্তর্গত পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য-এর অনুসারী হলেও কাব্য রচনার সময় কবির প্রধান প্রচেষ্টা ছিল পৌরাণিক জগন্নাথ-কাহিনিকে বাংলার জগন্নাথ উপাসনার সঙ্গে মিলিত যেন করে দেওয়া যায়। তাই মর্ত্যলোকে জগন্নাথের প্রকটলীলার পৌরাণিক কাহিনির সূত্রগুলি গ্রহণ করে সেই সূত্রগুলিকে সাধারণ বাঙালির উপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন কবি বিশ্বম্ভর দাস। এই কারণেই তিনি বাংলার লোকায়ত সমাজের অনুসঙ্গ বারবার তুলে ধরেছেন জগন্নাথমঙ্গলের বিভিন্ন অংশে। কবির এই প্রয়াসের জন্যই জগন্নাথের পৌরাণিক কাহিনি মঙ্গলকাব্যের ছকে অনূদিত হলেও লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলি এখানে অবাঞ্ছিত হয়নি। কবি বিশ্বম্ভর দাসের এই অনন্য প্রয়াসের জন্য সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বৃত্তে জগন্নাথমঙ্গল অনায়াসে হয়ে উঠতে পেরেছে সর্বস্তরের বাঙালির উপভোগ্য কাব্য এবং বিশ্বম্ভর দাস হয়ে উঠেছেন একজন কালোত্তীর্ণ যশস্বী কবি।

তথ্যসূত্র :

১. Bauman, Richard, "Differential Identity and the Social Base of folklore", Journal of Folklore, Vol. 84, No. 331, 1971, p. 33
২. দাস, বিশ্বম্ভর, 'জগন্নাথ-মঙ্গল', প্রথম সংস্করণ, গুপ্ত প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৫, পৃ. ২১
৩. তদেব, পৃ. ৫১
৪. তদেব, পৃ. ২৪
৫. তদেব, পৃ. ৯৬-৯৭
৬. তদেব, পৃ. ১৩৫
৭. তদেব, পৃ. ৫৮
৮. তদেব, পৃ. ৬৫-৬৬
৯. তদেব, পৃ. ১০৯
১০. তদেব, পৃ. ১২৯
১১. তদেব, পৃ. ৩৭
১২. তদেব, পৃ. ৩৯

১৩. চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার, 'চর্যাগীতির ভূমিকা', দ্বিতীয় সংস্করণ, ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২২২
১৪. দাস, বিশ্বম্ভর, 'জগন্নাথ-মঙ্গল', পৃ. ৩১
১৫. তদেব, পৃ. ৩০
১৬. তদেব, পৃ. ২৪
১৭. তদেব, পৃ. ২৪
১৮. তদেব, পৃ. ২৪, ৩৪
১৯. তদেব, পৃ. ৯৬
২০. তদেব, পৃ. ৯৬
২১. তদেব, পৃ. ১৮
২২. তদেব, পৃ. ৫১, ১৭
২৩. তদেব, পৃ. ৩৫
২৪. তদেব, পৃ. ১১৭, ১৫৫
২৫. তদেব, পৃ. ১৫৫
২৬. তদেব, পৃ. ২৪
২৭. তদেব, পৃ. ১০৩
২৮. তদেব, পৃ. ১০২, ১২০
২৯. তদেব, পৃ. ১০৪
৩০. তদেব, পৃ. ৫৪
৩১. তদেব, পৃ. ৮৬
৩২. তদেব, পৃ. ১০৯
৩৩. তদেব, পৃ. ৬৪
৩৪. তদেব, পৃ. ৭৫
৩৫. তদেব, পৃ. ৭৮
৩৬. তদেব, পৃ. ৩৭
৩৭. তদেব, পৃ. ৬৬
৩৮. তদেব, পৃ. ৪৭
৩৯. তদেব, পৃ. ৫৩
৪০. তদেব, পৃ. ৩৩